অষ্টাদশ অধ্যায়

পৃথু মহারাজ কর্তৃক পৃথিবী দোহন

শ্লোক ১

মৈত্রেয় উবাচ

ইত্থং পৃথুমভিষ্টূয় রুষা প্রস্ফুরিতাধরম্ ।
পুনরাহাবনির্ভীতা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা ॥ ১ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন; **ইত্থম্**—এইভাবে; **পৃথুম্**—পৃথু মহারাজকে; **অভিষ্টূয়**—স্তুতি করার পর; **রুষা**—ক্রোধে; **প্রস্ফুরিত**—কম্পিত; **অধরম্**—অধর; **পুনঃ**—পুনরায়; **আহ**—তিনি বললেন; **অবনিঃ**—পৃথিবী; **ভীতা**—ভয়ভীতা হয়ে; **সংস্তভ্য**—স্থির হয়ে; **আত্মানম্**—মন; **আত্মনা**—বুদ্ধির দ্বারা।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বিদুরকে বললেন—হে বিদুর! পৃথিবী এইভাবে স্তব করা সত্ত্বেও পৃথু মহারাজের ক্রোধ উপশম হল না, এবং অত্যন্ত ক্রোধের বশে তাঁর অধর তখন কম্পিত হচ্ছিল। পৃথিবী অত্যন্ত ভীতা হওয়া সত্ত্বেও, রাজাকে আশ্বস্ত করার জন্য এইভাবে বলতে শুরু করেছিলেন।

শ্লোক ২

সন্নিযচ্ছাভিভো মন্যুং নিবোধ শ্রাবিতং চ মে ।
সর্বতঃ সারমাদত্তে যথা মধুকরো বুধঃ ॥ ২ ॥

সন্নিযচ্ছ—দয়া করে শান্ত করুন; **অভিভো**—হে রাজন্; **মন্যুম্**—ক্রোধ; **নিবোধ**—বুঝতে চেষ্টা করুন; **শ্রাবিতম্**—যা কিছু বলা হয়েছে; **চ**—ও; **মে**—আমার দ্বারা; **সর্বতঃ**—সব জায়গা থেকে; **সারম্**—সার; **আদত্তে**—গ্রহণ করে; **যথা**—যেমন; **মধু-করঃ**—ভ্রমর; **বুধঃ**—বুদ্ধিমান ব্যক্তি।

অনুবাদ

হে ভগবান! দয়া করে আপনি ক্রোধ সংবরণ করুন এবং আমি আপনাকে যা নিবেদন করছি, তা ধৈর্য সহকারে শ্রবণ করুন। দয়া করে এই বিষয়ে আপনি একটু বিবেচনা করুন। আমি অত্যন্ত দীন হতে পারি, কিন্তু মধুকর যেমন প্রতিটি ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করে, ঠিক তেমনই পণ্ডিত ব্যক্তি সমস্ত বিষয় থেকেই তার সারভাগ গ্রহণ করেন।

শ্লোক ৩

অস্মিঁল্লোকেঽথবামুষ্মিন্মুনিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ।
দৃষ্টা যোগাঃ প্রযুক্তাশ্চ পুংসাং শ্রেয়ঃপ্রসিদ্ধয়ে ॥ ৩ ॥

অস্মিন্—এই; **লোকে**—জীবনে; **অথ বা**—অথবা; **অমুষ্মিন্**—পরবর্তী জীবনে; **মুনিভিঃ**—মহর্ষিদের দ্বারা; **তত্ত্ব**—সত্য; **দর্শিভিঃ**—দ্রষ্টাদের দ্বারা; **দৃষ্টাঃ**—নির্দিষ্ট হয়েছে; **যোগাঃ**—পদ্ধতি; **প্রযুক্তাঃ**—প্রয়োগ করা হয়েছে; **চ**—ও; **পুংসাম্**—জনসাধারণের; **শ্রেয়ঃ**—মঙ্গল; **প্রসিদ্ধয়ে**—লাভ করার জন্য।

অনুবাদ

সমগ্র মানব-সমাজের মঙ্গলের জন্য, কেবল ইহলোকেই নয়, পরলোকেও মানুষের উন্নতি সাধনের জন্য তত্ত্বদর্শী মুনিঋষিরা বিবিধ উপায় নির্ণয় করে গেছেন।

তাৎপর্য

বৈদিক সভ্যতায় মানব-সমাজের মঙ্গলের জন্য বৈদিক শাস্ত্রের এবং মুনি-ঋষিদের দ্বারা প্রদত্ত জ্ঞানের উপযোগ করা হয়। বৈদিক নির্দেশকে বলা হয় শ্রুতি, এবং মহান ঋষিরা সেই বিষয়ে যে অতিরিক্ত জ্ঞান প্রদান করেছেন, তাকে বলা হয় স্মৃতি। মানব-সমাজের কর্তব্য এই শ্রুতি এবং স্মৃতি উভয় জ্ঞানেরই সদ্ব্যবহার করা। কেউ যদি পারমার্থিক জীবনে উন্নতি করতে চান, তা হলে তাকে সেই সমস্ত নির্দেশ পালন করা অবশ্য কর্তব্য। *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন যে, কেউ যদি নিজেকে অত্যন্ত উন্নত স্তরের পারমার্থবাদী বলে প্রচার করতে চায়, অথচ শ্রুতি ও স্মৃতির নির্দেশ পালন করে না, সমাজের সে একটি উৎপাত-স্বরূপ। কেবল পরমার্থিক জীবনেই নয়, জড়-জাগতিক জীবনেও শ্রুতি ও স্মৃতির নির্দেশ অনুসরণ করা কর্তব্য। মানব-সমাজের বিশেষ কর্তব্য হচ্ছে *মনুস্মৃতি* অনুসরণ করা, কারণ মানবজাতির জনক মনু বিশেষ করে মানুষদের জন্য সেই সংহিতাটি প্রদান করে গেছেন।

মনুস্মৃতিতে বলা হয়েছে যে, স্ত্রীলোকদের কখনও স্বাধীনতা দেওয়া উচিত নয়। পক্ষান্তরে তারা যেন পিতা, পতি ও প্রাপ্তবয়স্ক পুত্রদের দ্বারা সংরক্ষিত হয়। স্ত্রীলোকদের সর্ব অবস্থাতেই কোন অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে থাকা উচিত। বর্তমানে স্ত্রীলোকদেরও পুরুষদের মতো পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, অভিভাবকদের তত্ত্বাবধানে রয়েছেন যে-সমস্ত স্ত্রীলোকেরা তাদের থেকে, এই প্রকার স্বাধীন স্ত্রীলোকেরা অধিক সুখী নয়। শ্রুতি, স্মৃতি ও মহান ঋষিদের দেওয়া উপদেশগুলি যদি মানুষ অনুসরণ করে, তা হলে তারা কেবল ইহলোকেই নয়, পরলোকেও বাস্তবিকই সুখী হবেন। দুর্ভাগ্যবশত, কতকগুলি বদমায়েশ মানুষ সুখী হওয়ার কত নতুন নতুন উপায় উদ্ভাবন করছে। মানব-সমাজ তার ফলে জাগতিক ও আধ্যাত্মিক, উভয় প্রকার জীবনের আদর্শই হারিয়েছে, তাই মানুষেরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে, এবং পৃথিবীর কোথাও সুখ ও শান্তি নেই। রাষ্ট্রসংঘ যদিও মানব-সমাজের সমস্যাগুলির সমাধান করার চেষ্টা করছে, কিন্তু তারা নিজেরাই বিভ্রান্ত এবং সমস্যা-জর্জরিত। যেহেতু তারা বেদের উদার উপদেশগুলি গ্রহণ করছে না, তাই তারা অসুখী।

এই শ্লোকে *অস্মিন্* এবং *অমুষ্মিন্* শব্দ দুটি তাৎপর্যপূর্ণ। *অস্মিন্* মানে 'এই জীবনে' এবং *তমুষ্মিন্* মানে 'পরবর্তী জীবনে'। দুর্ভাগ্যবশত, এই যুগে বড় বড় অধ্যাপক ও পণ্ডিতেরাও মনে করে যে, পরলোক বলে কিছু নেই এবং এই জীবনেই সব কিছু শেষ হয়ে যাবে। যেহেতু তারা হচ্ছে এক-একটি মহামূর্খ এবং মহাধূর্ত, তাই তারা কি উপদেশ দেবে? কিন্তু তবুও তাদের মহাপণ্ডিত এবং বড় বড় অধ্যাপক বলে মনে করা হয়। এই শ্লোকে *অমুষ্মিন* শব্দটি অত্যন্ত সুস্পষ্ট। প্রত্যেকের জীবন এমনভাবে গড়ে তোলা উচিত, যার ফলে তার পরবর্তী জীবনও লাভপ্রদ হয়। একটি বালক যেমন বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করে, যাতে পরবর্তী জীবন সুখী হয়, তেমনই এই জীবনে যথাযথভাবে শিক্ষালাভ করতে হবে, যাতে মৃত্যুর পর নিত্য আনন্দময় জীবন লাভ করা যায়। তাই মানব-জীবনের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শ্রুতি এবং স্মৃতির নির্দেশ অনুসারে জীবন যাপন করা অত্যন্ত আবশ্যক।

শ্লোক ৪

তানাতিষ্ঠতি যঃ সম্যগুপায়ান্ পূর্বদর্শিতান্ ।
অবরঃ শ্রদ্ধয়োপেত উপেয়ান্ বিন্দতেঽঞ্জসা ॥ ৪ ॥

তান্—সেগুলি; **আতিষ্ঠতি**—পালন করে; **যঃ**—যে-কেউ; **সম্যক্**—সম্যক্‌রূপে; **উপায়ান্**—উপায়; **পূর্ব**—পূর্বে; **দর্শিতান্**—নির্দেশিত; **অবরঃ**—অনভিজ্ঞ; **শ্রদ্ধয়া**—শ্রদ্ধা সহকারে; **উপেতঃ**—অবস্থিত হয়ে; **উপেয়ান্**—কর্মফল; **বিন্দতে**—উপভোগ করে; **অঞ্জসা**—অনায়াসে।

অনুবাদ

যিনি পূর্বতন মহর্ষিদের প্রদর্শিত উপায় ব্যবহারিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যথাযথভাবে অনুসরণ করেন, তিনি অনায়াসে তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য সাধন করতে পারেন।

তাৎপর্য

বেদে বলা হয়েছে, *মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ*—অর্থাৎ, মুক্ত মহাপুরুষদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা কর্তব্য। তার ফলে আমরা ইহজন্মে এবং পরজন্মে লাভবান হতে পারি। এই সমস্ত নির্দেশ অনুসরণ করা হলে, আমাদের জড়-জাগতিক জীবনেও লাভ হয়। প্রাচীন মহর্ষি এবং মহাপুরুষেরা যে সমস্ত নির্দেশ দিয়ে গেছেন, সেগুলি অনুসরণ করলে, আমরা অনায়াসে জীবনের উদ্দেশ্য অবগত হতে পারি। এই শ্লোকে *অবরঃ* অর্থাৎ 'অনভিজ্ঞ' শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। প্রতিটি বদ্ধ জীবই অনভিজ্ঞ। প্রতিটি মানুষই *অবোধ-জাত*—জন্মসূত্রে মূর্খ ও অজ্ঞ। বর্তমানে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সব রকমের মূর্খ ও অজ্ঞরা সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে। কিন্তু তারা কি করতে পারে? তাদের তৈরি সংবিধানের কি পরিণতি? আজ তারা একটা আইন তৈরি করছে, আর কালই তাদের খেয়াল-খুশিমতো সেটিকে তারা নাকচ করছে। একটি রাজনৈতিক দল একটি উদ্দেশ্য নিয়ে দেশকে কাজে লাগাচ্ছে, তার পরেই আর একটি রাজনৈতিক দল অন্য এক ধরনের সরকার তৈরি করে, সমস্ত আইন-কানুনগুলি নাকচ করে দিচ্ছে। এই চর্বিত-চর্বণ করার পন্থা *(পুনঃ পুনশ্চর্বিত-চর্বণানাম্)* কখনই মানব-সমাজের সুখ ও সমৃদ্ধি আনতে পারে না। সমগ্র মানব-সমাজকে সুখী ও সমৃদ্ধিশালী করতে হলে, মুক্ত পুরুষদের দেওয়া আদর্শ পন্থা গ্রহণ করতে হবে।

শ্লোক ৫

তাননাদৃত্য যোঽবিদ্বানর্থানারভতে স্বয়ম্ ।
তস্য ব্যভিচরন্ত্যর্থা আরব্ধাশ্চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৫ ॥

তান্—সেই সমস্ত; **অনাদৃত্য**—উপেক্ষা করে; **যঃ**—যিনি; **অবিদ্বান্**—মূর্খ; **অর্থান্**—পরিকল্পনা; **আরভতে**—শুরু করে; **স্বয়ম্**—ব্যক্তিগতভাবে; **তস্য**—তার; **ব্যভিচরন্তি**—সফল হয় না; **অর্থাঃ**—উদ্দেশ্য; **আরব্ধাঃ**—প্রচেষ্টা করে; **চ**—এবং; **পুনঃ পুনঃ**—বার বার।

অনুবাদ

যে সমস্ত মূর্খ মানুষ নির্ভুল নির্দেশ প্রদানকারী মহর্ষিদের প্রামাণিকতা অস্বীকার করে, তাদের স্বতন্ত্র ইচ্ছা অনুসারে কল্পিত উপায়সমূহ উদ্ভাবন করে তাদের সেই সমস্ত প্রচেষ্টা কেবলই বার বার নিষ্ফল হয়।

তাৎপর্য

পূর্বতন আচার্য এবং মুক্ত পুরুষদের দেওয়া নিষ্কলুষ নির্দেশগুলি অমান্য করা আজকাল একটি ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজকাল মানুষেরা এতই অধঃপতিত যে, তারা মুক্ত জীব ও বদ্ধ জীবের পার্থক্য নিরূপণ করতে পারে না। বদ্ধ জীব চারটি দোষে দুষ্ট—সে ভুল করে, সে প্রমাদগ্রস্ত হতে বাধ্য, তার প্রতারণা করার প্রবণতা রয়েছে এবং তার ইন্দ্রিয়গুলি ত্রুটিপূর্ণ। তাই আমাদের নির্দেশ গ্রহণ করতে হবে মুক্ত পুরুষদের কাছ থেকে। এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন পরমেশ্বর ভগবানের কাছ থেকে সরাসরিভাবে নির্দেশ প্রাপ্ত হচ্ছে সেই সমস্ত ব্যক্তিদের মাধ্যমে, যাঁরা নিষ্ঠাসহকারে ভগবানের নির্দেশ পালন করছেন। অনুগামী যদি মুক্ত পুরুষ নাও হন, কিন্তু তিনি যদি পরম মুক্ত পরমেশ্বর ভগবানকে অনুসরণ করেন, তা হলে তাঁর কার্যকলাপও জড়া প্রকৃতির কলুষ থেকে স্বভাবিকভাবেই মুক্ত হয়ে যায়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাই বলেছেন, "আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ।" পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য বাণীতে পূর্ণরূপে শ্রদ্ধাপরায়ণ হলে এবং তাঁর নির্দেশ অনুসরণ করলে, তৎক্ষণাৎ গুরু হওয়া যায়। বিষয়ী মানুষেরা মুক্ত পুরুষদের কাছ থেকে নির্দেশ গ্রহণ করতে আগ্রহী নয়, কিন্তু তারা তাদের নিজেদের মনগড়া সমস্ত মতবাদে অত্যন্ত আগ্রহী, যার ফলে তাদের সমস্ত প্রয়াসেই বার বার তারা ব্যর্থ হয়। যেহেতু সারা পৃথিবী আজ বদ্ধ জীবদের ভ্রান্ত নির্দেশ অনুসরণ করছে, তাই আজ মানব-সমাজ সম্পূর্ণরূপে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে।

শ্লোক ৬

পুরা সৃষ্টা হ্যোষধয়ো ব্রহ্মণা যা বিশাম্পতে ।
ভুজ্যমানা ময়া দৃষ্টা অসদ্ভিরধৃতব্রতৈঃ ॥ ৬ ॥

পুরা—পুরাকালে; **সৃষ্টাঃ**—সৃষ্ট; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **ওষধয়ঃ**—ওষধি ও শস্য; **ব্রহ্মণা**—ব্রহ্মার দ্বারা; **যাঃ**—যা কিছু; **বিশাম্-পতে**—হে রাজন্; **ভুজ্যমানাঃ**—ভোগ করছে; **ময়া**—আমার দ্বারা; **দৃষ্টাঃ**—দেখে; **অসদ্ভিঃ**—অভক্তদের দ্বারা; **অধৃত-ব্রতৈঃ**—সব রকম আধ্যাত্মিক কার্যকলাপ বর্জিত।

অনুবাদ

হে রাজন্! পুরাকালে ব্রহ্মা যে-সমস্ত বীজ, মূল, ওষধি এবং শস্য সৃষ্টি করেছিলেন, তা এখন সমস্ত অভক্তরা ভোগ করছে, যারা সব রকম আধ্যাত্মিক জ্ঞানরহিত।

তাৎপর্য

ব্রহ্মা এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন জীবদের জন্য, কিন্তু সেই সৃষ্টির পিছনে পরিকল্পনা ছিল যে, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য যে-সমস্ত জীবেরা এখানে আসবে, তারা ব্রহ্মার দেওয়া বৈদিক নির্দেশ প্রাপ্ত হবে, যাতে তারা চরমে তাদের প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারে। পৃথিবীতে উৎপন্ন সমস্ত আবশ্যকীয় দ্রব্যগুলি, যথা—ফল, ফুল, গাছপালা, শস্য, পশু আদি সব কিছুরই সৃষ্টি হয়েছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সন্তুষ্টি-বিধানের নিমিত্ত যজ্ঞে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু গাভীরূপী পৃথিবী এখানে প্রার্থনা করছেন যে, এই সমস্ত বস্তুগুলি এখন অভক্তরা ব্যবহার করছে, যাদের পারমার্থিক উপলব্ধি সম্বন্ধে কোন পরিকল্পনা নেই। পৃথিবীতে যদিও শস্য, ফল, ফুল ইত্যাদি উৎপাদনের অপরিমেয় ক্ষমতা রয়েছে, কিন্তু পৃথিবী সেই উৎপাদন বন্ধ করে দিয়েছে, কারণ সেগুলি পারমার্থিক উদ্দেশ্য-রহিত অভক্তরা অসৎ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করছিল। সব কিছুই ভগবানের, এবং তাঁর সন্তুষ্টি-বিধানের জন্য সব কিছু ব্যবহার করা যেতে পারে। জীবের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য কোন কিছু ব্যবহার করা উচিত নয়। সেটিই হচ্ছে এই জড়া প্রকৃতির পরিকল্পনা।

এই শ্লোকে *অসদ্ভিঃ* এবং *অধৃত-ব্রতৈঃ* শব্দগুলি গুরুত্বপূর্ণ। *অসদ্ভিঃ* শব্দটি অভক্তদের ইঙ্গিত করে। *ভগবদ্গীতায়* অভক্তদের *দুষ্কৃতিনঃ* (দুষ্কৃতকারী), *মূঢ়াঃ* (গাধা অথবা বোকা), *নরাধমাঃ* (মানুষদের মধ্যে সব চাইতে অধঃপতিত) এবং *মায়য়াপহৃতাজ্ঞানাঃ* (মায়ার প্রভাবে যারা তাদের জ্ঞান হারিয়েছে), এই চারটি শ্রেণীতে বর্ণনা করা হয়েছে। এই সমস্ত মানুষেরা অসৎ বা অভক্ত। অভক্তদের *গৃহব্রতও* বলা হয়, আর ভক্তদের বলা হয় *ধৃতব্রত* । সমগ্র *বেদের* পরিকল্পনা হচ্ছে যে, সমস্ত বদ্ধ জীবেরা, যারা এই জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করতে

এসেছে, তাদের *ধৃতব্রত* হওয়ার শিক্ষা দেওয়া উচিত। অর্থাৎ তাদের কেবল পরমেশ্বর ভগবানের ইন্দ্রিয়ের সন্তুষ্টি-বিধান করার মাধ্যমে নিজেদের ইন্দ্রিয় বা জড়-জাগতিক জীবন উপভোগ করার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে হবে। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধনের উদ্দেশ্যে যে-সমস্ত কার্যকলাপ, সেগুলিকে বলা হয় *কৃষ্ণার্থেঽখিল-চেষ্টাঃ* । তা ইঙ্গিত করে যে, মানুষ সব রকমের কর্ম করার চেষ্টা করতে পারে, কিন্তু তা যেন শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি-বিধানের উদ্দেশ্যে সম্পাদিত হয়। *ভগবদ্গীতায়* তা *যজ্ঞার্থাৎ কর্ম* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। *যজ্ঞ* শব্দটি ভগবান বিষ্ণুকে ইঙ্গিত করে। সেই বিষ্ণুর সন্তুষ্টি-বিধানের উদ্দেশ্যেই আমাদের কর্ম করা উচিত। বর্তমান সময়ে (কলিযুগে), কিন্তু, মানুষ বিষ্ণুকে সম্পূর্ণরূপে ভুলে গেছে, এবং তারা তাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য সব কিছু করছে। এই সমস্ত মানুষেরা ধীরে ধীরে অত্যন্ত দারিদ্র্যগ্রস্ত হয়ে যাবে, কারণ পরমেশ্বর ভগবানের উপভোগের জন্য যে-সমস্ত সামগ্রী, তা তাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না। তারা যদি এইভাবে আচরণ করে তা হলে চরমে এমন দারিদ্র্য দেখা দেবে যে, তখন আর কোন শস্য, ফুল ইত্যাদি উৎপন্ন হবে না। *শ্রীমদ্ভাগবতের* দ্বাদশ স্কন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে যে, কলিযুগের শেষে মানুষ এতই কলুষিত হয়ে যাবে যে, তখন আর কোন শস্য, ফল, দুধ ইত্যাদি থাকবে না।

শ্লোক ৭

অপালিতানাদৃতা চ ভবদ্ভির্লোকপালকৈঃ ।
চোরীভূতেঽথ লোকেঽহং যজ্ঞার্থেঽগ্রসমোষধীঃ ॥ ৭ ॥

অপালিতা—পালন-রহিত; **অনাদৃতা**—উপেক্ষিতা; **চ**—ও; **ভবদ্ভিঃ**—আপনার মতো; **লোক-পালকৈঃ**—রাজ্যপাল বা রাজাদের দ্বারা; **চোরী-ভূতে**—চোরদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে; **অথ**—অতএব; **লোকে**—এই জগতে; **অহম্**—আমি; **যজ্ঞ-অর্থে**—যজ্ঞ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে; **অগ্রসম্**—লুকিয়ে রেখেছি; **ওষধীঃ**—সমস্ত ওষধি ও শস্য।

অনুবাদ

হে রাজন্! কেবল শস্য এবং ওষধিই অভক্তদের দ্বারা অসৎ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হচ্ছে, তাই নয়, যথাযথভাবে আমার পালনও হচ্ছে না। ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের উদ্দেশ্যে খাদ্যশস্য ব্যবহার করে যারা চোরে পরিণত হয়েছে, সেই সমস্ত দুর্বৃত্তদের দণ্ডদানে অক্ষম রাজাদের দ্বারাও আমি অনাদৃতা। তাই আমি সমস্ত বীজ লুকিয়ে রেখেছি, কারণ সেগুলি প্রকৃতপক্ষে যজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য ব্যবহার করার কথা।

তাৎপর্য

পৃথু মহারাজ এবং তাঁর পিতা বেণ রাজার সময় যা ঘটেছিল, তা বর্তমান সময়েও হচ্ছে। বিশাল পরিমাণে শিল্পজাত দ্রব্য এবং কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদনের জন্য বিরাট আয়োজন করা হয়েছে, কিন্তু তা সবই ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের উদ্দেশ্যে। তাই এত উৎপাদন ক্ষমতা সত্ত্বেও মানুষের অভাব দূর হয়নি, কারণ পৃথিবী চোর-বাটপারে পরিপূর্ণ। *চোরী*-ভূতে শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, জনসাধারণ চোরে পরিণত হয়েছে। বৈদিক তত্ত্বজ্ঞান অনুসারে, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য যখন অর্থনৈতিক উন্নতির পরিকল্পনা করা হয়, তখন মানুষ চোরে পরিণত হয়। *ভগবদ্গীতাতেও* বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান বা যজ্ঞকে নিবেদন না করে যখন মানুষ খাদ্যশস্য আহার করে, তখন সে চোরে পরিণত হয় এবং তাকে দণ্ডভোগ করতে হয়। আধ্যাত্মিক সাম্যবাদ অনুসারে, ব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুই ভগবানের সম্পত্তি। জনসাধারণের সেই সমস্ত সম্পদ উপযোগ করার অধিকার তখনই হয়, যখন সেগুলি ভগবানের উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়। সেটি হচ্ছে প্রসাদ গ্রহণ করার পন্থা। ভগবৎ প্রসাদ যে আহার করে না, সে অবশ্যই একটি চোর। রাজ্যপাল এবং রাজাদের কর্তব্য হচ্ছে এই সমস্ত চোরদের দণ্ড দিয়ে সুষ্ঠুভাবে পৃথিবী পালন করা। তা যদি না করা হয়, তা হলে আর খাদ্যশস্য উৎপাদন হবে না, এবং মানুষকে অনাহারে থাকতে হবে। অবশ্য তাদের যে-কেবল অন্নাভাবই হবে, তাই নয়, তখন তারা পরস্পরকে হত্যা করে তাদের মাংস খাবে। তারা ইতিমধ্যেই মাংসের জন্য পশুহত্যা করছে, তাই যখন শস্য, শাকসবজি এবং ফল থাকবে না, তখন তারা তাদের নিজেদের পিতা ও পুত্রদের হত্যা করে তাদের মাংস খাবে।

শ্লোক ৮

নূনং তা বীরুধঃ ক্ষীণা ময়ি কালেন ভূয়সা ।
তত্র যোগেন দৃষ্টেন ভবানাদাতুমর্হতি ॥ ৮ ॥

নূনম্—অতএব; **তাঃ**—তারা; **বীরুধঃ**—ওষধি ও শস্য; **ক্ষীণাঃ**—জীর্ণ; **ময়ি**—আমার মধ্যে; **কালেন**—যথাসময়ে; **ভূয়সা**—অত্যন্ত; **তত্র**—অতএব; **যোগেন**—যথাযথ উপায়ের দ্বারা; **দৃষ্টেন**—প্রসিদ্ধ; **ভবান্**—আপনি; **আদাতুম্**—গ্রহণ করতে; **অর্হতি**—উচিত।

অনুবাদ

দীর্ঘকাল আমার ভিতর সঞ্চিত থাকার ফলে, এই সমস্ত শস্যবীজ নিশ্চয়ই জীর্ণ হয়েছে। তাই আচার্য বা শাস্ত্র নির্দেশিত উপযুক্ত উপায়ে, সেই সমস্ত বীজগুলি এখনই উদ্ধার করা আপনার কর্তব্য।

তাৎপর্য

যখন খাদ্যশস্যের অভাব হয়, তখন সরকারের কর্তব্য শাস্ত্রবর্ণিত এবং আচার্যদের দ্বারা অনুমোদিত বিধি পালন করা; তা হলে যথেষ্ট পরিমাণে শস্য উৎপাদন হবে, এবং খাদ্যাভাব ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ করা যাবে। *ভগবদ্গীতায়* যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ফলে, আকাশে পর্যাপ্ত মেঘ একত্রিত হয়, এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃষ্টি হয়। এইভাবে কৃষিকার্য সুচারুরূপে সম্পাদিত হয়। যখন পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্যশস্য উৎপাদন হয়, তখন মানুষ শস্যজাত খাদ্য আহার করে, এবং গো-মেষ আদি গৃহপালিত জন্তুরাও ঘাস ও শস্য আহার করে। এই ব্যবস্থা অনুসারে মানুষ যদি যজ্ঞ করে, তা হলে আর খাদ্যাভাব থাকবে না। কলিযুগের একমাত্র যজ্ঞ হচ্ছে সংকীর্তন যজ্ঞ।

এই শ্লোকে দুটি তাৎপর্যপূর্ণ শব্দ হচ্ছে—*যোগেন,* 'অনুমোদিত উপায়ে', এবং *দৃষ্টেন* 'পূর্বতন আচার্যদের দৃষ্টান্ত অনুসারে'। কেউ যদি মনে করে যে, ট্রাক্টর আদি আধুনিক যন্ত্রের প্রয়োগের দ্বারা শস্য উৎপাদন করা যায়, তা হলে সে মস্ত বড় ভুল করছে। কেউ যদি মরুভূমিতে গিয়ে ট্রাক্টর ব্যবহার করে, তা হলেও শস্য উৎপাদনের সম্ভাবনা থাকে না। আমরা নানা প্রকার উপায় অবলম্বন করতে পারি, কিন্তু আমাদের ভালভাবে জেনে রাখা উচিত যে, যজ্ঞ না হলে পৃথিবী শস্য উৎপাদন করবে না। পৃথিবী ইতিমধ্যেই বিশ্লেষণ করেছেন যে, যেহেতু অভক্তরা খাদ্যশস্য উপভোগ করছে, তাই তিনি যজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য সমস্ত খাদ্যশস্যের বীজ সংরক্ষণ করে রেখেছেন। নাস্তিকেরা অবশ্য খাদ্যশস্য উৎপাদনের এই আধ্যাত্মিক পন্থাটিতে বিশ্বাস করবে না। কিন্তু তারা বিশ্বাস করুক অথবা নাই করুক, যান্ত্রিক উপায়ে যে খাদ্যশস্য উৎপাদন করা যায় না, সেই কথা অন্তত বুঝতে কারোরই অসুবিধা হয় না। অনুমোদিত বিধি সম্বন্ধে শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই যুগে বুদ্ধিমান মানুষেরা সংকীর্তন যজ্ঞের দ্বারা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আরাধনা করবেন, যাঁর অঙ্গকান্তি তপ্তকাঞ্চনের মতো এবং যিনি সারা পৃথিবী জুড়ে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন প্রচার করার জন্য সর্বদা তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্তদের দ্বারা পরিবেষ্টিত। বর্তমান পরিস্থিতিতে, একমাত্র কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন

বা সংকীর্তন প্রবর্তনের মাধ্যমেই কেবল এই পৃথিবীকে রক্ষা করা যেতে পারে। পূর্ববর্তী শ্লোকে আমরা জানতে পেরেছি যে, যে কৃষ্ণভক্ত নয়, সে চোর। জড়-জাগতিক বিচারে তাকে অত্যন্ত উন্নত বলে মনে হলেও, একটি চোর কখনও সুখী হতে পারে না। সে দণ্ডনীয়। মানুষ যেহেতু কৃষ্ণভক্তির অনুশীলন করছে না, তাই তারা চোরে পরিণত হয়েছে, এবং তার ফলে তারা প্রকৃতির নিয়মে দণ্ডভোগ করছে। কেউই তা প্রতিহত করতে পারবে না। জনহিতকর কার্যের জন্য যত রকম ত্রাণ তহবিল এবং প্রতিষ্ঠান খোলা হোক না কেন, তাতে কোন কাজ হবে না। পৃথিবীর মানুষ যদি কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন না করে, তা হলে অন্নাভাব এবং বহু দুঃখকষ্ট তাদের ভোগ করতে হবে।

শ্লোক ৯-১০

বৎসং কল্পয় মে বীর যেনাহং বৎসলা তব ।
ধোক্ষ্যে ক্ষীরময়ান্ কামাননুরূপং চ দোহনম্ ॥ ৯ ॥
দোগ্ধারং চ মহাবাহো ভূতানাং ভূতভাবন ।
অন্নমীপ্সিতমূর্জস্বদ্ভগবান্ বাঞ্ছতে যদি ॥ ১০ ॥

বৎসম্—বাছুর; **কল্পয়**—ব্যবস্থা কর; **মে**—আমার জন্য; **বীর**—হে বীর; **যেন**—যার দ্বারা; **অহম্**—আমি; **বৎসলা**—স্নেহপূর্ণ; **তব**—আপনার; **ধোক্ষ্যে**—পূর্ণ করব; **ক্ষীর-ময়ান্**—দুগ্ধরূপে; **কামান্**—বাঞ্ছিত বস্তুসকল; **অনুরূপম্**—বিভিন্ন জীবের প্রয়োজন অনুসারে; **চ**—ও; **দোহনম্**—দোহনপাত্র; **দোগ্ধারম্**—দোহনকারী; **চ**—ও; **মহা-বাহো**—হে মহাবাহো; **ভূতানাম্**—সমস্ত জীবদের; **ভূত-ভাবন**—হে জীবদের রক্ষাকারী; **অন্নম্**—অন্ন; **ঈপ্সিতম্**—বাঞ্ছিত; **ঊর্জঃ-বৎ**—বলপ্রদ; **ভগবান্**—হে পরম পূজ্য; **বাঞ্ছতে**—ইচ্ছা করেন; **যদি**—যদি।

অনুবাদ

হে মহাবীর! হে ভূতভাবন! আপনি যদি প্রচুর খাদ্যশস্য প্রদান করে জীবদের কষ্ট নিবারণ করতে চান, এবং আপনি যদি আমাকে দোহন করে তাদের পোষণ করতে চান, তা হলে আপনি উপযুক্ত বৎস, দোহনপাত্র ও দোগ্ধা নিরূপণ করুন, যাতে আমি আমার বৎসের প্রতি অত্যন্ত বৎসলা হয়ে, আপনার বাসনা অনুসারে দুগ্ধ প্রদান করতে পারি।

তাৎপর্য

গাভী দোহন করার ব্যাপারে এই উপদেশগুলি খুব সুন্দর। প্রথমে গাভীটির যেন একটি বৎস থাকে, যার প্রতি বৎসলা হয়ে গাভী স্বেচ্ছায় পর্যাপ্ত পরিমাণে দুধ প্রদান করবে। সুদক্ষ দোগ্ধা এবং দুধ রাখার জন্য উপযুক্ত দোহন-পাত্রেরও প্রয়োজন। গাভী যেমন বৎস ব্যতীত যথেষ্ট দুধ প্রদান করতে পারে না, তেমনই পৃথিবীও কৃষ্ণভক্তদের প্রতি বৎসলা না হয়ে, প্রচুর পরিমাণে অন্ন উৎপাদন করতে পারে না। পৃথিবীর গাভী রূপটি যদিও রূপক অর্থে গ্রহণ করা যেতে পারে, তবুও তার ভাবার্থটি এখানে অত্যন্ত স্পষ্ট। বাছুর যেমন গাভীকে দুগ্ধ উৎপাদনে অনুপ্রাণিত করে, তেমনই মানুষ যদি অসৎ বা অধৃতব্রত না হয়, তা হলে সমস্ত জীবেরা এমন কি পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, সরীসৃপ ও জলচর সকলেই পৃথিবীর কাছ থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণে তাদের অন্ন প্রাপ্ত হতে পারে, যে-কথা আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। মানব-সমাজ যখন অসৎ বা ভগবৎ-বিমুখ বা কৃষ্ণভক্তি-বিহীন হয়, তখন সারা পৃথিবী দুঃখকষ্ট ভোগ করে। মানুষ যদি সৎ আচরণ করে, তা হলে পশুদেরও খাদ্যাভাব হয় না এবং তারা সুখে থাকে। ভগবৎ-বিমুখ মানুষেরা তাদের কর্তব্য সম্বন্ধে অজ্ঞ থেকে, পশুদের সুরক্ষা ও আহার প্রদান করার পরিবর্তে, তাদের হত্যা করে নিজেদের উদর পূর্তি করে। তার ফলে কেউই সুখী হয় না, এবং আজকের পৃথিবীর দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থার সেটিই হচ্ছে কারণ।

শ্লোক ১১

সমাং চ কুরু মাং রাজন্‌দেববৃষ্টং যথা পয়ঃ ।
অপর্তাবপি ভদ্রং তে উপাবর্তেত মে বিভো ॥ ১১ ॥

সমাম্—সমতল; **চ**—ও; **কুরু**—করুন; **মাম্**—আমাকে; **রাজন্**—হে রাজন্; **দেব-বৃষ্টম্**—ইন্দ্রের কৃপায় বর্ষারূপে পতিত; **যথা**—যাতে; **পয়ঃ**—জল; **অপ-ঋতৌ**—বর্ষা ঋতু যখন শেষ হয়ে যায়; **অপি**—ও; **ভদ্রম্**—মঙ্গল; **তে**—আপনাকে; **উপাবর্তেত**—থাকতে পারে; **মে**—আমার উপর; **বিভো**—হে ভগবান।

অনুবাদ

হে রাজন্! আপনি আমাকে এমনভাবে সমতল করুন, যেন বর্ষা ঋতু শেষ হয়ে গেলেও, ইন্দ্রদেব-বর্ষিত জল আমার উপরিভাগে সর্বত্রই সমভাবে থাকতে পারে এবং পৃথিবীকে আর্দ্র রাখতে পারে। তার ফলে সর্বপ্রকার উৎপাদনের জন্য তা অত্যন্ত শুভ হবে।

তাৎপর্য

দেবরাজ ইন্দ্র বজ্র ও বৃষ্টির অধ্যক্ষ। সাধারণত পর্বতকে ভেঙে টুকরা টুকরা করার জন্য পর্বত শিখরে বজ্রপাত করা হয়। এই সমস্ত টুকরাগুলি যখন কালক্রমে ভূপৃষ্ঠে ছড়ায়, তখন ভূপৃষ্ঠ কৃষিযোগ্য হয়। সমতল-ভূমি শস্য উৎপাদনের জন্য বিশেষ উপযোগী। তাই পৃথু মহারাজের কাছে পৃথিবী অনুরোধ করেছিলেন, তিনি যেন উচ্চ ভূমি ও পর্বত ভেঙে পৃথিবীকে সমতল করেন।

শ্লোক ১২

ইতি প্রিয়ং হিতং বাক্যং ভুব আদায় ভূপতিঃ ।
বৎসং কৃত্বা মনুং পাণাবদুহৎসকলৌষধীঃ ॥ ১২ ॥

ইতি—এইভাবে; **প্রিয়ম্**—মধুর; **হিতম্**—হিতকর; **বাক্যম্**—বাক্য; **ভুবঃ**—পৃথিবীর; **আদায়**—বিচার করে; **ভূ-পতিঃ**—রাজা; **বৎসম্**—বৎস; **কৃত্বা**—করে; **মনুম্**—স্বায়ম্ভুব মনুকে; **পাণৌ**—তাঁর হাতে; **অদুহৎ**—দোহন করেছিলেন; **সকল**—সমস্ত; **ওষধীঃ**—ওষধি ও শস্য।

অনুবাদ

পৃথিবীর এই প্রিয় ও হিতকর বাক্য শ্রবণ করে পৃথু মহারাজ প্রসন্ন হয়েছিলেন। তার পর তিনি স্বায়ম্ভুব মনুকে বৎস রূপে গ্রহণ করে, তাঁর নিজের হাতকে দোহন পাত্ররূপে পরিণত করে, পৃথিবীরূপ গাভী থেকে সমস্ত ওষধি ও শস্য দোহন করেছিলেন।

শ্লোক ১৩

তথাপরে চ সর্বত্র সারমাদদতে বুধাঃ ।
ততোঽন্যে চ যথাকামং দুদুহুঃ পৃথুভাবিতাম্ ॥ ১৩ ॥

তথা—সেইভাবে; **অপরে**—অন্যেরা; **চ**—ও; **সর্বত্র**—সর্বত্র; **সারম্**—নির্যাস; **আদদতে**—গ্রহণ করেছিল; **বুধাঃ**—বুদ্ধিমান শ্রেণীর মানুষেরা; **ততঃ**—তার পর; **অন্যে**—অন্যেরা; **চ**—ও; **যথা-কামম্**—ইচ্ছা অনুসারে; **দুদুহুঃ**—দোহন করেছিলেন; **পৃথু-ভাবিতাম্**—পৃথু মহারাজের নিয়ন্ত্রণাধীন পৃথিবীকে।

অনুবাদ

অন্যেরা, যাঁরা পৃথু মহারাজের মতো বুদ্ধিমান ছিলেন, তাঁরাও পৃথিবী থেকে সার গ্রহণ করেছিলেন। বাস্তবিকপক্ষে সকলেই সেই সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন, এবং পৃথু মহারাজের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, তাঁদের বাসনা অনুসারে তাঁরা পৃথিবীর কাছ থেকে সমস্ত বস্তু প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

পৃথিবীকে বলা হয় *বসুন্ধরা* । *বসু* মানে হচ্ছে 'ঐশ্বর্য', এবং *ধরা* মানে হচ্ছে 'যিনি ধারণ করেন'। এই পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীরা মানুষদের আবশ্যকতা পূর্ণ করে, এবং যথাযথ উপায়ে সমস্ত জীবদের পৃথিবী থেকে বার করে নিয়ে যাওয়া যায়। ধরিত্রী পৃথু মহারাজকে বলেছিলেন যে, পৃথিবী থেকে যা কিছু গ্রহণ করা হয়—খনি থেকে, পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে অথবা বায়ুমণ্ডল থেকে—তা সবই ভগবানের সম্পত্তি বলে সর্বদা মনে করা উচিত এবং যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা উচিত। সেইভাবে সব কিছু উপযোগ করার পন্থা পৃথু মহারাজ প্রবর্তন করেছিলেন। যজ্ঞ বন্ধ হওয়া মাত্রই পৃথিবী তাঁর সমস্ত উৎপাদন—শাকসবজি, ফলমূল, ফুল এবং অন্যান্য কৃষিজাত ও খনিজ পদার্থ সংবরণ করে নেবেন। *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে যে, সৃষ্টির আদি থেকেই যজ্ঞের পন্থা প্রবর্তিত হয়েছিল। নিয়মিত যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা, সমভাবে ধনসম্পদ বিতরণের দ্বারা এবং ইন্দ্রিয় সংযমের দ্বারা সারা পৃথিবীকে শান্তি ও সমৃদ্ধিপূর্ণ করা যাবে। ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই কলিযুগে অতি সরল সংকীর্তন যজ্ঞ অনুষ্ঠান—কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ প্রবর্তিত মহোৎসব—প্রত্যেক শহরে ও গ্রামে প্রবর্তন করা উচিত। বুদ্ধিমান মানুষদের ব্যক্তিগত আচরণের দ্বারা সংকীর্তন যজ্ঞ অনুষ্ঠানে অনুপ্রেরণা দেওয়া উচিত। অর্থাৎ, অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, আমিষ আহার, দ্যূতক্রীড়া এবং আসবপান বর্জন করে, তাদের তপশ্চর্যার পন্থা অনুসরণ করা উচিত। সমাজের বুদ্ধিমান মানুষ অথবা ব্রাহ্মণেরা যদি এই বিধিনিষেধ অনুসরণ করেন, তা হলে পৃথিবীর বর্তমান দুর্দশাগ্রস্ত পরিস্থিতির পরিবর্তন হবে, এবং মানুষ সুখ ও সমৃদ্ধি লাভ করতে পারবে।

শ্লোক ১৪

ঋষয়ো দুদুহুর্দেবীমিন্দ্রিয়েষ্বথ সত্তম ।
বৎসং বৃহস্পতিং কৃত্বা পয়শ্ছন্দোময়ং শুচি ॥ ১৪ ॥

ঋষয়ঃ—মহর্ষিগণ; **দুদুহুঃ**—দোহন করেছিলেন; **দেবীম্**—পৃথিবীকে; **ইন্দ্রিয়েষু**—ইন্দ্রিয়সমূহকে; **অথ**—তার পর; **সত্তম**—হে বিদুর; **বৎসম্**—বৎস; **বৃহস্পতিম্**—বৃহস্পতিকে; **কৃত্বা**—করে; **পয়ঃ**—দুধ; **ছন্দঃ-ময়ম্**—বৈদিক মন্ত্ররূপে; **শুচি**—পবিত্র।

অনুবাদ

মহর্ষিগণ বৃহস্পতিকে বৎসে পরিণত করে এবং তাঁদের ইন্দ্রিয়সমূহকে দোহনপাত্রে পরিণত করে, তাঁদের বাণী, মন ও শ্রবণ পবিত্র করার জন্য সর্বপ্রকার বৈদিক জ্ঞান দোহন করেছিলেন।

তাৎপর্য

বৃহস্পতি হচ্ছেন স্বর্গলোকের পুরোহিত। কেবল এই গ্রহেই নয়, ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র মহর্ষিরা মানব-সমাজের মঙ্গলের জন্য বৃহস্পতির মাধ্যমে যুক্তিসঙ্গত পন্থায় বৈদিক জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছিলেন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, বৈদিক জ্ঞান সমস্ত মানব-সমাজে আবশ্যকীয় বলে বিবেচনা করা হয়। মানব-সমাজ যদি কেবল দেহ ধারণের জন্য পৃথিবী থেকে খাদ্যশস্য এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় বস্তুগুলি আহরণ করে সন্তুষ্ট থাকে, তা হলে মানব-সমাজ কখনও যথেষ্টভাবে সমৃদ্ধিশালী হবে না। মানুষের মন ও কর্ণের আহারেরও অবশ্য প্রয়োজন। জিহ্বাকে স্পন্দিত করাও মানুষের আর একটি প্রয়োজন। সেই দিব্য শব্দতরঙ্গ হচ্ছে সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের সারাতিসার মহামন্ত্র—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে। কলিযুগে ভগবদ্ভক্তির পন্থায় যদি নিয়মিতভাবে এই মহামন্ত্র শ্রবণ ও কীর্তন করা হয়, তা হলে সমগ্র মানব-সমাজ পবিত্র হবে, এবং তার ফলে সমস্ত মানুষ জাগতিক ও পারমার্থিক, উভয় ক্ষেত্রেই সুখী হবেন।

শ্লোক ১৫

কৃত্বা বৎসং সুরগণা ইন্দ্রং সোমমদূদুহন্ ।
হিরণ্ময়েন পাত্রেণ বীর্যমোজো বলং পয়ঃ ॥ ১৫ ॥

কৃত্বা—বানিয়ে; **বৎসম্**—বৎস; **সুর-গণাঃ**—দেবতারা; **ইন্দ্রম্**—দেবরাজ ইন্দ্রকে; **সোমম্**—অমৃত; **অদূদুহন্**—দোহন করেছিলেন; **হিরণ্ময়েন**—স্বর্ণময়; **পাত্রেণ**—পাত্রে; **বীর্যম্**—মানসিক শক্তি; **ওজঃ**—ইন্দ্রিয়ের শক্তি; **বলম্**—দেহের শক্তি; **পয়ঃ**—দুধ।

অনুবাদ

সমস্ত দেবতারা দেবরাজ ইন্দ্রকে বৎসে পরিণত করে, পৃথিবী থেকে সোমরসরূপ অমৃত দোহন করেছিলেন। তার ফলে তাঁদের মানসিক ক্ষমতা, দেহের ক্ষমতা এবং ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতা অত্যন্ত প্রবল হয়েছিল।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *সোম* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'অমৃত'। *সোম* এক প্রকার পানীয়, যা স্বর্গলোকে চন্দ্রমা থেকে বানানো হয়। এই সোমরস পান করে দেবতারা মন, ইন্দ্রিয় ও শরীরে শক্তি লাভ করে। *হিরণ্ময়েন পাত্রেণ* শব্দ দুটি ইঙ্গিত করে যে, সোম কোন সাধারণ মাদক পানীয় নয়। দেবতারা কোন রকম মাদকদ্রব্য স্পর্শ পর্যন্ত করেন না। সোম এক প্রকার নেশাকারী ঔষধও নয়। এটি সম্পূর্ণ ভিন্ন এক প্রকার পানীয়, যা কেবল স্বর্গলোকেই পাওয়া যায়। আসুরিক মানুষেরা যে আসব তৈরি করে, সোম তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, যে-কথা পরবর্তী শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

শ্লোক ১৬

দৈতেয়া দানবা বৎসং প্রহ্লাদমসুরর্ষভম্ ।
বিধায়াদূদুহন্ ক্ষীরময়ঃপাত্রে সুরাসবম্ ॥ ১৬ ॥

দৈতেয়াঃ—দিতির পুত্ররা; **দানবাঃ**—দানবেরা; **বৎসম্**—বৎস; **প্রহ্লাদম্**—প্রহ্লাদ মহারাজকে; **অসুর**—অসুর; **ঋষভম্**—প্রধান; **বিধায়**—বানিয়ে; **অদূদুহন্**—তারা দোহন করেছিল; **ক্ষীরম্**—দুধ; **অয়ঃ**—লৌহ; **পাত্রে**—পাত্রে; **সুরা**—সুরা; **আসবম্**—মদ্য।

অনুবাদ

দৈত্য-দানবেরা অসুরকুলশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদ মহারাজকে বৎস বানিয়ে, বিভিন্ন প্রকার সুরা এবং আসব দোহন করেছিল, যা তারা লৌহপাত্রে রেখেছিল।

তাৎপর্য

দেবতাদের পানীয় যেমন সোমরস, তেমনই দৈত্য ও দানবদের পানীয় হচ্ছে সুরা ও মদ্য। দিতির থেকে উৎপন্ন অসুরেরা সুরা ও মদ পান করে আনন্দ পায়। এমন কি আজও আসুরিক বৃত্তিসম্পন্ন মানুষেরা সুরা ও মদের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত।

এই সম্পর্কে প্রহ্লাদ মহারাজের নামটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। যেহেতু প্রহ্লাদ মহারাজ দৈত্যকুলে হিরণ্যকশিপুর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাই তাঁর কৃপায় অসুরেরা সুরা ও মদ্যরূপে তাদের পানীয় প্রাপ্ত হয়েছিল এবং এখনও পাচ্ছে। *অয়ঃ* (লৌহ) শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। অমৃতময় সোমরস স্বর্ণপাত্রে রাখা হয়েছিল, আর সুরা ও মদ্য ছিল লৌহপাত্রে। যেহেতু সুরা ও মদ্য নিকৃষ্ট, তাই তা লৌহপাত্রে রাখা হয়, এবং যেহেতু সোমরস উৎকৃষ্ট, তাই তা স্বর্ণপাত্রে রাখা হয়েছে।

শ্লোক ১৭

গন্ধর্বাপ্সরসোঽধুক্ষন্ পাত্রে পদ্মময়ে পয়ঃ ।
বৎসং বিশ্বাবসুং কৃত্বা গান্ধর্বং মধু সৌভগম্ ॥ ১৭ ॥

গন্ধর্ব—গন্ধর্বেরা; **অপ্সরসঃ**—অপ্সরাগণ; **অধুক্ষন্**—দোহন করেছিলেন; **পাত্রে**—পাত্রে; **পদ্ম-ময়ে**—পদ্ম থেকে প্রস্তুত; **পয়ঃ**—দুধ; **বৎসম্**—বৎস; **বিশ্বা-বসুম্**—বিশ্বাবসু নামক; **কৃত্বা**—বানিয়ে; **গান্ধর্বম্**—সঙ্গীত; **মধু**—মধুর; **সৌভগম্**—সৌন্দর্য।

অনুবাদ

গন্ধর্ব ও অপ্সরারা বিশ্বাবসুকে বৎস বানিয়ে, পদ্মফুলের পাত্রে দুগ্ধ দোহন করেছিলেন। সেই দুগ্ধ মধুর সঙ্গীতকলা ও সৌন্দর্যের রূপ ধারণ করেছিল।

শ্লোক ১৮

বৎসেন পিতরোঽর্যম্না কব্যং ক্ষীরমধুক্ষত ।
আমপাত্রে মহাভাগাঃ শ্রদ্ধয়া শ্রাদ্ধদেবতাঃ ॥ ১৮ ॥

বৎসেন—বৎসের দ্বারা; **পিতরঃ**—পিতৃগণ; **অর্যম্না**—পিতৃলোকের দেবতা অর্যমার দ্বারা; **কব্যম্**—পিতৃদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত খাদ্য; **ক্ষীরম্**—দুগ্ধ; **অধুক্ষত**—দোহন করেছিল; **আম-পাত্রে**—অপক্ক মৃন্ময় পাত্রে; **মহা-ভাগাঃ**—মহাভাগ্যবান; **শ্রদ্ধয়া**—গভীর শ্রদ্ধা সহকারে; **শ্রাদ্ধ-দেবতাঃ**—শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানের অধ্যক্ষ দেবতাগণ।

অনুবাদ

শ্রাদ্ধকর্মের মুখ্য দেবতা সৌভাগ্যবান পিতৃগণ অর্যমাকে বৎস বানিয়ে অত্যন্ত শ্রদ্ধাসহকারে অপক্ক মৃন্ময় পাত্রে কব্য দোহন করেছিলেন, যা হচ্ছে পিতৃদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত অন্ন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৯/২৫) বলা হয়েছে, *পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ* । যারা পরিবারের কল্যাণ-সাধনে আগ্রহী, তাদের বলা হয় *পিতৃব্রতাঃ* । পিতৃলোক নামক একটি গ্রহলোক রয়েছে, এবং সেই লোকের প্রধান বিগ্রহ হচ্ছেন অর্যমা। তিনি এক প্রকার দেবতা, এবং তাঁর সন্তুষ্টি-বিধান করার মাধ্যমে কোন ব্যক্তি প্রেতযোনি প্রাপ্ত পরিবারের সদস্যদের স্থূল শরীর লাভে সাহায্য করতে পারে। যারা অত্যন্ত পাপী এবং পরিবার, গৃহ, গ্রাম অথবা দেশের প্রতি আসক্ত, তারা জড় উপাদান রচিত স্থূল দেহ প্রাপ্ত হয় না, পক্ষান্তরে তারা মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার দ্বারা রচিত সূক্ষ্ম শরীরে থাকে। যারা এই প্রকার সূক্ষ্ম শরীরে থাকে তাদের বলা হয় প্রেত। এই প্রেত অবস্থা অত্যন্ত কষ্টদায়ক, কারণ তাদের বুদ্ধি, মন ও অহঙ্কার রয়েছে এবং তারা জড়-জাগতিক জীবন উপভোগ করতে চায়, কিন্তু যেহেতু তাদের স্থূল জড় শরীর নেই, তাই তারা তাদের মনোবাসনা পূর্ণ করতে পারে না, এবং তার ফলে তারা নানা রকম উৎপাত করে। পরিবারের সদস্যদের, বিশেষ করে মৃত ব্যক্তির পুত্রের কর্তব্য হচ্ছে অর্যমা বা ভগবান বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে নৈবেদ্য উৎসর্গ করা। ভারতবর্ষে অনাদি কাল ধরে মৃত ব্যক্তির পুত্র গয়ায় গিয়ে প্রেতযোনি প্রাপ্ত পিতার উদ্ধারের জন্য, সেখানে বিষ্ণু মন্দিরে পিণ্ডদান করে আসছে। এমন নয় যে, সকলের পিতাই প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয়, কিন্তু এই পিণ্ড ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পাদপদ্মে নিবেদন করা হয়, যাতে বংশের কেউ যদি প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয়ে থাকেন, তা হলে তিনি স্থূল শরীর প্রাপ্ত হবেন। কিন্তু কেউ যদি বিষ্ণুপ্রসাদ গ্রহণে অভ্যস্ত হয়ে থাকেন, তা হলে তাঁর প্রেতযোনি প্রাপ্ত হওয়ার অথবা মনুষ্যেতর জন্ম লাভ করার কোন সম্ভাবনা থাকে না। বৈদিক সভ্যতায় মৃত আত্মার কল্যাণের জন্য শ্রদ্ধা ও ভক্তিসহকারে খাদ্যদ্রব্য নিবেদন করার মাধ্যমে শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানের প্রচলন রয়েছে। কেউ যদি শ্রদ্ধা ও ভক্তিসহকারে ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে অথবা পিতৃলোকে ভগবানের প্রতিনিধি অর্যমাকে নৈবেদ্য উৎসর্গ করে, তা হলে তার পূর্বপুরুষেরা তাঁদের কর্ম অনুসারে ইন্দ্রিয় সুখভোগের জন্য স্থূল জড় শরীর প্রাপ্ত হতে পারেন। অর্থাৎ, তাঁদের প্রেতযোনি প্রাপ্ত হতে হয় না।

শ্লোক ১৯

প্রকল্প্য বৎসং কপিলং সিদ্ধাঃ সঙ্কল্পনাময়ীম্ ।
সিদ্ধিং নভসি বিদ্যাং চ যে চ বিদ্যাধরাদয়ঃ ॥ ১৯ ॥

প্রকল্প্য—নিযুক্ত করে; **বৎসম্**—বৎস; **কপিলম্**—কপিল মুনিকে; **সিদ্ধাঃ**—সিদ্ধলোকবাসীরা; **সঙ্কল্পনা-ময়ীম্**—ইচ্ছা অনুসারে; **সিদ্ধিম্**—যোগসিদ্ধি; **নভসি**—আকাশে; **বিদ্যাম্**—জ্ঞান; **চ**—ও; **যে**—যাঁরা; **চ**—ও; **বিদ্যাধর-আদয়ঃ**—বিদ্যাধর প্রভৃতি।

অনুবাদ

তার পর সিদ্ধলোক-বাসীরা এবং বিদ্যাধরলোক-বাসীরা কপিল মুনিকে বৎসরূপে পরিণত করে, এবং আকাশকে পাত্র করে, অণিমা আদি যোগসিদ্ধি দোহন করেছিলেন। বস্তুত বিদ্যাধরেরা আকাশে উড়ার বিদ্যা লাভ করেছিলেন।

তাৎপর্য

সিদ্ধলোক ও বিদ্যাধরলোক-বাসীরা স্বভাবতই যোগশক্তি সমন্বিত, যার ফলে তাঁরা কেবল বিনা বিমানে অন্তরীক্ষে ভ্রমণ করতেই সক্ষম, তাই নয়, তাঁরা তাঁদের ইচ্ছা অনুসারে এক গ্রহ থেকে আর এক গ্রহে পর্যন্ত যেতে পারেন। মাছ যেমন জলে সন্তরণ করতে পারে, বিদ্যাধরেরা তেমনই বায়ুর সমুদ্রে সাঁতার দিতে পারেন। সিদ্ধলোক-বাসীরা সমস্ত যোগসিদ্ধি-সমন্বিত। এই লোকের যোগীরা যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি সমন্বিত অষ্টাঙ্গযোগ অনুশীলন করেন। নিয়মিতভাবে একটির পর একটি এই যোগের অনুশীলনের ফলে, যোগীরা নানা প্রকার সিদ্ধি লাভ করেন; তাঁরা অণিমা, লঘিমা আদি যোগসিদ্ধি লাভ করেন। এমন কি তাঁরা একটি গ্রহ পর্যন্ত সৃষ্টি করতে পারেন, এবং তাঁদের ইচ্ছা অনুসারে সব কিছু প্রাপ্ত হতে পারেন এবং যে-কোন মানুষকে বশীভূত করতে পারেন। সিদ্ধলোক-বাসীরা স্বাভাবিকভাবেই এই সমস্ত যৌগিক ক্ষমতা-সমন্বিত। এই গ্রহে আমরা যদি কোন মানুষকে বিনা যানে উড়তে দেখি, তা হলে তা অবশ্যই একটি অত্যন্ত আশ্চর্যজনক বিষয় হবে, কিন্তু বিদ্যাধরলোকে আকাশে উড়ার ব্যাপারটি পাখির আকাশে উড়ার মতোই সাধারণ ঘটনা। তেমনই, সিদ্ধলোকের সমস্ত অধিবাসীরা হচ্ছেন যোগসিদ্ধি-সমন্বিত মহাযোগী।

এই শ্লোকে কপিল মুনির নামটি তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ তিনি সাংখ্য-দর্শনের প্রবর্তক, এবং তাঁর পিতা কর্দম মুনি ছিলেন এক মহান সিদ্ধযোগী। কর্দম মুনি এমনই একটি বিমান তৈরি করেছিলেন, যা ছিল একটি ছোটখাটো শহরের মতো এবং তাতে নানা প্রকার উদ্যান, প্রাসাদ এবং বহু দাসদাসী ছিল। এই সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে কপিলদেবের মাতা দেবহূতি এবং পিতা কর্দম মুনি ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন লোকে ভ্রমণ করেছিলেন।

শ্লোক ২০

অন্যে চ মায়িনো মায়ামন্তর্ধানাদ্ভুতাত্মনাম্ ।
ময়ং প্রকল্প্য বৎসং তে দুদুহুর্ধারণাময়ীম্ ॥ ২০ ॥

অন্যে—অন্যরা; **চ**—ও; **মায়িনঃ**—মায়াবী যাদুকর; **মায়াম্**—মায়াবী শক্তি; **অন্তর্ধান**—অদৃশ্য হওয়ার; **অদ্ভুত**—আশ্চর্যজনক; **আত্মনাম্**—দেহের; **ময়ম্**—ময়দানব; **প্রকল্প্য**—পরিণত করে; **বৎসম্**—বৎস; **তে**—তাঁরা; **দুদুহুঃ**—দোহন করেছিলেন; **ধারণা-ময়ীম্**—ইচ্ছা থেকে উৎপন্ন।

অনুবাদ

কিম্পুরুষের লোকবাসীরা ময়দানবকে বৎস বানিয়ে, সংকল্পমাত্র অদৃশ্য হওয়ার এবং অন্যরূপে আবির্ভূত হওয়ার বিদ্যা দোহন করেছিলেন।

তাৎপর্য

বলা হয় যে, কিম্পুরুষের লোকবাসীরা নানা রকম অদ্ভুত যোগশক্তি প্রদর্শন করতে পারেন। অর্থাৎ যত রকম আশ্চর্যজনক বস্তু কল্পনা করা যায়, তাঁরা তা সব প্রদর্শন করতে পারেন। কিম্পুরুষ-বাসীরা তাঁদের ইচ্ছামতো বা কল্পনা মাত্র যে-কোন কার্য সাধন করতে পারেন। এইগুলিও যোগশক্তি। এই প্রকার যোগশক্তিকে *ঈশিতা* বলা হয়। অসুরেরা সাধারণত যোগ অভ্যাসের দ্বারা এই প্রকার শক্তি আয়ত্ত করে। *শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধে, অসুরদের নানা রকম আশ্চর্যজনক রূপ পরিগ্রহ করে, শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে আবির্ভূত হওয়ার সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। যেমন, শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর গোপসখাদের সম্মুখে বকাসুর এক বিশাল বকপক্ষীরূপে আবির্ভূত হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণ যখন এই গ্রহে উপস্থিত ছিলেন, তখন তাঁকে বহু অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছিল, যারা কিম্পুরুষদের মতো অদ্ভুত যোগশক্তি প্রদর্শন করেছিল। কিম্পুরুষেরা যদিও স্বাভাবিকভাবে এই প্রকার শক্তিসমন্বিত, তবে যোগ অনুশীলনের ফলে, এই সমস্ত যোগশক্তি এই গ্রহলোকের যে-কেউ লাভ করতে পারে।

শ্লোক ২১

যক্ষরক্ষাংসি ভূতানি পিশাচাঃ পিশিতাশনাঃ ।
ভূতেশবৎসা দুদুহুঃ কপালে ক্ষতজাসবম্ ॥ ২১ ॥

যক্ষ—যক্ষগণ (কুবেরের বংশধরগণ); **রক্ষাংসি**—রাক্ষসেরা (মাংসভোজীরা); **ভূতানি**—ভূতেরা; **পিশাচা**—পিশাচেরা; **পিশিত-অশনাঃ**—যারা মাংস আহারে অভ্যস্ত; **ভূতেশ**—শিবের অবতার রুদ্র; **বৎসাঃ**—বৎস; **দুদুহুঃ**—দোহন করেছিলেন; **কপালে**—মাথার খুলির পাত্রে; **ক্ষত-জ**—রক্ত; **আসবম্**—মদ্য।

অনুবাদ

তার পর যক্ষ, রাক্ষস, ভূত এবং পিশাচেরা, যারা মাংস আহারে অভ্যস্ত, তারা শিবের অবতার রুদ্রকে বৎসে পরিণত করে, নর-কপালরূপ পাত্রে রক্ত থেকে প্রস্তুত মদ্য দোহন করেছিল।

তাৎপর্য

মনুষ্যরূপী কিছু জীব রয়েছে, যাদের জীবন ধারণের উপায় এবং আহার অত্যন্ত জঘন্য। সাধারণত তাদের খাদ্য হচ্ছে মাংস এবং পানীয় হচ্ছে রক্ত থেকে প্রস্তুত মদ্য, যা এই শ্লোকে *ক্ষতজাসবম্* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তমোগুণাশ্রিত যক্ষ, রাক্ষস, ভূত এবং পিশাচেরা হচ্ছে এই প্রকার অধম মানুষদের নেতা। এরা সকলে রুদ্রের অধীন। রুদ্র হচ্ছেন তমোগুণের ঈশ্বর শিবের অবতার। শিবের অন্য আর একটি নাম হচ্ছে ভূতনাথ, অর্থাৎ 'ভূতদের প্রভু।' ব্রহ্মা যখন চার কুমারদের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন, তখন তাঁর ভ্রূযুগলের মধ্য থেকে রুদ্রের জন্ম হয়েছিল।

শ্লোক ২২

তথাহয়ো দন্দশূকাঃ সর্পা নাগাশ্চ তক্ষকম্ ।
বিধায় বৎসং দুদুহুর্বিলপাত্রে বিষং পয়ঃ ॥ ২২ ॥

তথা—তেমনই; **অহয়ঃ**—ফণাহীন সর্প; **দন্দশূকাঃ**—বৃশ্চিক; **সর্পাঃ**—ফণাযুক্ত সর্প; **নাগাঃ**—বিশাল সর্প; **চ**—এবং; **তক্ষকম্**—সর্পদের নেতা তক্ষক; **বিধায়**—বানিয়ে; **বৎসম্**—বৎস; **দুদুহুঃ**—দোহন করেছিল; **বিল-পাত্রে**—সাপের গর্তকে পাত্র বানিয়ে; **বিষম্**—বিষ; **পয়ঃ**—দুধের মতো।

অনুবাদ

তার পর ফণাহীন সর্প, ফণাযুক্ত সর্প, বিশাল নাগ, বৃশ্চিক এবং অন্যান্য সমস্ত বিষধর প্রাণীরা তক্ষককে বৎস বানিয়ে, সাপের গর্তরূপ পাত্রে পৃথিবী থেকে বিষ দোহন করেছিল।

তাৎপর্য

এই জড় জগতে নানা প্রকার প্রাণী রয়েছে, এবং এই শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কিভাবে সরীসৃপ এবং বৃশ্চিকদের জীবন নির্বাহের ব্যবস্থা ভগবান করেছেন। লক্ষ্যণীয় যে, সকলেই তাদের আহার্য পৃথিবী থেকে গ্রহণ করছে। জড়া প্রকৃতির গুণের সঙ্গ প্রভাবে বিশেষ প্রকার চরিত্র গঠিত হয়। *পয়ঃ-পানং ভুজঙ্গানাম্*—কেউ যদি সাপকে দুধ খাওয়ায়, তা হলে সাপের বিষই কেবল বর্ধিত হয়। কিন্তু, কেউ যদি কোন প্রতিভাশালী ঋষি অথবা মহাত্মাকে দুধ প্রদান করেন, তা হলে তাঁদের মস্তিষ্কের সূক্ষ্ম কোষগুলি বিকশিত হবে, যার ফলে তাঁরা উচ্চতর আধ্যাত্মিক চিন্তা করতে পারেন। এইভাবে ভগবান সকলকেই আহার প্রদান করছেন, কিন্তু জড়া প্রকৃতির গুণের সঙ্গ প্রভাবে জীবের বিশেষ চরিত্র গঠিত হয়।

শ্লোক ২৩-২৪

পশবো যবসং ক্ষীরং বৎসং কৃত্বা চ গোবৃষম্ ।
অরণ্যপাত্রে চাধুক্ষন্মৃগেন্দ্রেণ চ দংষ্ট্রিণঃ ॥ ২৩ ॥
ক্রব্যাদাঃ প্রাণিনঃ ক্রব্যং দুদুহুঃ স্বে কলেবরে ।
সুপর্ণবৎসা বিহগাশ্চরং চাচরমেব চ ॥ ২৪ ॥

পশবঃ—পশু; **যবসম্**—সবুজ ঘাস; **ক্ষীরম্**—দুধ; **বৎসম্**—বৎস; **কৃত্বা**—পরিণত করে; **চ**—ও; **গো-বৃষম্**—শিবের বাহন বৃষ; **অরণ্য-পাত্রে**—অরণ্যরূপ পাত্রে; **চ**—ও; **অধুক্ষন্**—দোহন করেছিল; **মৃগ-ইন্দ্রেণ**—সিংহের দ্বারা; **চ**—এবং; **দংষ্ট্রিণঃ**—তীক্ষ্ণ দন্তবিশিষ্ট পশু; **ক্রব্য-অদাঃ**—যে-সমস্ত পশু কাঁচা মাংস খায়; **প্রাণিনঃ**—জীব; **ক্রব্যম্**—মাংস; **দুদুহুঃ**—দোহন করেছিল; **স্বে**—নিজের; **কলেবরে**—তাদের দেহরূপ পাত্রে; **সুপর্ণ**—গরুড়; **বৎসাঃ**—বৎস; **বিহগাঃ**—পক্ষীরা; **চরম্**—জঙ্গম জীবেরা; **চ**—ও; **অচরম্**—স্থাবর জীবেরা; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **চ**—ও।

অনুবাদ

গবাদি চতুষ্পদ প্রাণীরা শিবের বাহন বৃষকে বৎস করে এবং অরণ্যকে পাত্র করে তাদের আহারের জন্য তাজা সবুজ ঘাস দোহন করেছিল। ব্যাঘ্র আদি হিংস্র পশুরা সিংহকে বৎস বানিয়ে তাদের আহার্যরূপে মাংস দোহন করেছিল। পক্ষীরা গরুড়কে বৎস বানিয়ে, পৃথিবী থেকে তাদের আহার্যরূপে জঙ্গম কীটপতঙ্গ এবং স্থাবর তৃণগুল্ম দোহন করেছিল।

তাৎপর্য

ভগবান বিষ্ণুর বাহন গরুড় থেকে বহু মাংসাশী পক্ষীর উদ্ভব হয়েছে। এক প্রকার পক্ষী আছে যারা বানর খেতে খুব ভালবাসে। ঈগল পাখিরা মেষশাবক আহার করতে ভালবাসে, আবার অন্য অনেক পাখি রয়েছে, যারা কেবল ফল খায়। তাই এই শ্লোকে *চরম্* শব্দে হচ্ছে জঙ্গম প্রাণী, এবং *অচরম্* শব্দে তৃণ, ফল আদি বোঝানো হয়েছে।

শ্লোক ২৫

বটবৎসা বনস্পতয়ঃ পৃথগ্রসময়ং পয়ঃ ।
গিরয়ো হিমবদ্বৎসা নানাধাতূন্ স্বসানুষু ॥ ২৫ ॥

বট-বৎসাঃ—বটবৃক্ষকে বৎস বানিয়ে; **বনঃ-পতয়ঃ**—বৃক্ষরাজি; **পৃথক্**—বিভিন্ন; **রস-ময়ম্**—রসরূপে; **পয়ঃ**—দুগ্ধ; **গিরয়ঃ**—পর্বত; **হিমবৎ-বৎসাঃ**—হিমালয়কে বৎস বানিয়ে; **নানা**—বিবিধ; **ধাতূন্**—ধাতু; **স্ব**—নিজেদের; **সানুষু**—তাদের চূড়ায়।

অনুবাদ

বৃক্ষরা বটবৃক্ষকে বৎস বানিয়ে বিভিন্ন প্রকার সুস্বাদু রস দোহন করেছিল। পর্বতেরা হিমালয়কে বৎস বানিয়ে, শৃঙ্গরূপ পাত্রে বিভিন্ন প্রকার ধাতু দোহন করেছিল।

শ্লোক ২৬

সর্বে স্বমুখ্যবৎসেন স্বে স্বে পাত্রে পৃথক্ পয়ঃ ।
সর্বকামদুঘাং পৃথ্বীং দুদুহুঃ পৃথুভাবিতাম্ ॥ ২৬ ॥

সর্বে—সমস্ত; **স্ব-মুখ্য**—তাদের প্রধানদের দ্বারা; **বৎসেন**—বৎসরূপে; **স্বে স্বে**—তাদের নিজেদের; **পাত্রে**—পাত্রে; **পৃথক্**—ভিন্ন ভিন্ন; **পয়ঃ**—দুধ; **সর্ব-কাম**—সমস্ত বাঞ্ছিত বস্তু; **দুঘাম্**—দুধরূপে; **পৃথ্বীম্**—পৃথিবীকে; **দুদুহুঃ**—দোহন করেছিল; **পৃথু-ভাবিতাম্**—মহারাজ পৃথুর নিয়ন্ত্রণাধীনে।

অনুবাদ

পৃথিবী সকলকে তাদের উপযুক্ত আহার প্রদান করেছিলেন। পৃথু মহারাজের রাজত্বকালে পৃথিবী সম্পূর্ণরূপে তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীনে ছিলেন। তার ফলে পৃথিবীর

সমস্ত প্রাণীরা তাদের স্ব স্ব জাতির প্রধান ব্যক্তিকে বৎসে পরিণত করে, বিভিন্ন প্রকার পাত্রে তাদের খাদ্যরূপ পৃথক পৃথক বস্তু লাভ করেছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবান যে সকলের আহার প্রদান করেন তা এখানে প্রমাণিত হয়েছে। বেদেও বলা হয়েছে—*একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্* । ভগবান যদিও এক, তবুও তিনি সকলের প্রয়োজনীয় সমস্ত বস্তু পৃথিবীর মাধ্যমে প্রদান করেন। বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন প্রকার প্রাণী রয়েছে, এবং তারা তাদের নিজের নিজের গ্রহলোক থেকে তাদের খাদ্যদ্রব্য বিভিন্নরূপে প্রাপ্ত হয়। এই বর্ণনার পর, মানুষ কিভাবে বলতে পারে যে, চন্দ্রলোকে কোন জীব নেই? পঞ্চভূতের দ্বারা গঠিত হওয়ার ফলে, প্রতিটি চন্দ্রলোক পার্থিব। প্রতিটি গ্রহলোক তাদের নিবাসীদের জন্য বিভিন্ন প্রকার খাদ্য উৎপাদন করে। চন্দ্রে কোন খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয় না অথবা সেখানে কোন প্রাণী নেই বলে যে মতবাদ প্রচার হচ্ছে, বৈদিক শাস্ত্র অনুসারে তা সত্য নয়।

শ্লোক ২৭

এবং পৃথ্বাদয়ঃ পৃথ্বীমন্নাদাঃ স্বন্নমাত্মনঃ ।
দোহবৎসাদিভেদেন ক্ষীরভেদং কুরূদ্বহ ॥ ২৭ ॥

এবম্—এইভাবে; **পৃথু-আদয়ঃ**—পৃথু মহারাজ এবং অন্যেরা; **পৃথ্বীম্**—পৃথিবীকে; **অন্ন-অদাঃ**—আহার করতে অভিলাষী সমস্ত জীবেরা; **সু-অন্নম্**—তাদের বাঞ্ছিত খাদ্য; **আত্মনঃ**—জীবন ধারণের জন্য; **দোহ**—দোহন করার জন্য; **বৎস-আদি**—বৎস, পাত্র এবং দোগ্ধা; **ভেদেন**—বিভিন্ন; **ক্ষীর**—দুধ; **ভেদম্**—বিভিন্ন; **কুরু-উদ্বহ**—হে কুরুশ্রেষ্ঠ।

অনুবাদ

হে কুরুশ্রেষ্ঠ বিদুর! এইভাবে পৃথু প্রমুখ অন্নভোজী জীবেরা ভিন্ন ভিন্ন বৎস সৃষ্টি করে ভিন্ন ভিন্ন দোহনপাত্রে তাদের অভীষ্ট খাদ্যরূপ দুগ্ধ দোহন করেছিলেন।

শ্লোক ২৮

ততো মহীপতিঃ প্রীতঃ সর্বকামদুঘাং পৃথুঃ ।
দুহিতৃত্বে চকারেমাং প্রেম্না দুহিতৃবৎসলঃ ॥ ২৮ ॥

ততঃ—তার পর; **মহী-পতিঃ**—রাজা; **প্রীতঃ**—প্রসন্ন হয়ে; **সর্ব-কাম**—সমস্ত বাঞ্ছিত বস্তু; **দুঘাম্**—দুগ্ধরূপে উৎপাদনকারী; **পৃথুঃ**—পৃথু মহারাজ; **দুহিতৃত্বে**—দুহিতারূপী; **চকার**—করেছিলেন; **ইমাম্**—এই পৃথিবীকে; **প্রেম্না**—স্নেহবশত; **দুহিতৃ-বৎসলঃ**—কন্যাবৎসল।

অনুবাদ

তার পর, পৃথিবী সমস্ত জীবদের বিভিন্ন প্রকার আহার্য প্রদান করেছিলেন বলে, পৃথু মহারাজ তাঁর প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছিলেন, এবং তিনি অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ হয়ে পৃথিবীকে দুহিতৃত্বে বরণ করেছিলেন।

শ্লোক ২৯

চূর্ণয়ন্ স্বধনুষ্কোট্যা গিরিকূটানি রাজরাট্ ।
ভূমণ্ডলমিদং বৈণ্যঃ প্রায়শ্চক্রে সমং বিভুঃ ॥ ২৯ ॥

চূর্ণয়ন্—চূর্ণবিচূর্ণ করে; **স্ব**—নিজের; **ধনুঃ-কোট্যা**—ধনুকের বলের দ্বারা; **গিরি**—পর্বতের; **কূটানি**—শিখর; **রাজ-রাট্**—সম্রাট; **ভূ-মণ্ডলম্**—সমগ্র পৃথিবীর; **ইদম্**—এই; **বৈণ্যঃ**—বেণের পুত্র; **প্রায়ঃ**—প্রায়; **চক্রে**—করেছিলেন; **সমম্**—সমতল; **বিভুঃ**—শক্তিমান।

অনুবাদ

তার পর, রাজাধিরাজ মহারাজ পৃথু তাঁর ধনুকের শক্তির দ্বারা গিরিপর্বত চূর্ণবিচূর্ণ করে, পৃথিবীপৃষ্ঠ সমতল করেছিলেন। তাঁরই কৃপায় পৃথিবী প্রায় সমতল হয়েছে।

তাৎপর্য

সাধারণত পৃথিবীর পার্বত্য অংশগুলি বজ্রাঘাতে সমতল করা হয়। সাধারণত সেটি স্বর্গলোকের দেবরাজ ইন্দ্রের কার্য, কিন্তু ভগবানের অবতার পৃথু মহারাজ সেই জন্য ইন্দ্রের প্রতীক্ষা করেননি। তিনি নিজেই তাঁর সুদৃঢ় ধনুকের দ্বারা সেই কার্য সম্পন্ন করেছিলেন।

শ্লোক ৩০

অথাস্মিন্ ভগবান্ বৈণ্যঃ প্রজানাং বৃত্তিদঃ পিতা ।
নিবাসান্ কল্পয়াঞ্চক্রে তত্র তত্র যথার্হতঃ ॥ ৩০ ॥

অথ—এইভাবে; **অস্মিন্**—এই পৃথিবীর উপর; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **বৈণ্যঃ**—বেণপুত্র; **প্রজানাম্**—প্রজাদের; **বৃত্তিদঃ**—বৃত্তি প্রদানকারী; **পিতা**—পিতা; **নিবাসান্**—বাসস্থান; **কল্পয়াম্**—উপযুক্ত; **চক্রে**—বানিয়ে; **তত্র তত্র**—ইতস্তত; **যথা**—যেমন; **অর্হতঃ**—বাঞ্ছিত, উপযুক্ত।

অনুবাদ

রাজ্যের সমস্ত প্রজাদের কাছে পৃথু মহারাজ ছিলেন ঠিক পিতার মতো। তাই তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য উপযুক্ত বৃত্তি প্রদানে তিনি ব্যস্ত ছিলেন। পৃথিবীপৃষ্ঠ সমতল করার পর, সকলের বৃত্তি এবং বাসনা অনুসারে, তিনি তাদের বাসস্থানের জন্য উপযুক্ত স্থান নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন।

শ্লোক ৩১

গ্রামান্ পুরঃ পত্তনানি দুর্গাণি বিবিধানি চ ।
ঘোষান্ ব্রজান্ সশিবিরানাকরান্ খেটখর্বটান্ ॥ ৩১ ॥

গ্রামান্—গ্রাম; **পুরঃ**—নগর; **পত্তনানি**—পত্তন; **দুর্গাণি**—দুর্গ; **বিবিধানি**—নানা প্রকার; **চ**—ও; **ঘোষান্**—গোপপল্লী; **ব্রজান্**—গোশালা; **স-শিবিরান্**—সেনানিবাস; **আকরান্**—খনি; **খেট**—কৃষকদের গ্রাম; **খর্বটান্**—পর্বতস্থ গ্রাম।

অনুবাদ

এইভাবে পৃথু মহারাজ বহু গ্রাম, নগর, পত্তন, দুর্গ, ঘোষপল্লী, গোশালা, সেনানিবাস, খনি, কৃষকদের গ্রাম এবং পাহাড়ী গ্রাম প্রভৃতি বাসস্থান নির্মাণ করে দিয়েছিলেন।

শ্লোক ৩২

প্রাক্‌পৃথোরিহ নৈবৈষা পুরগ্রামাদিকল্পনা ।
যথাসুখং বসন্তি স্ম তত্র তত্রাকুতোভয়াঃ ॥ ৩২ ॥

প্রাক্—পূর্ব; **পৃথোঃ**—পৃথু মহারাজের; **ইহ**—এই লোকে; **ন**—কখনই না; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **এষা**—এই; **পুর**—নগরীর; **গ্রাম-আদি**—গ্রাম ইত্যাদি; **কল্পনা**—পরিকল্পিত ব্যবস্থা; **যথা**—যেমন; **সুখম্**—সুবিধাজনক; **বসন্তি স্ম**—বাস করেছিল; **তত্র তত্র**—ইতস্তত; **অকুতঃ-ভয়াঃ**—নির্ভয়ে।

অনুবাদ

পৃথু মহারাজের রাজত্বকালের পূর্বে এই ভূমণ্ডলে নগর, গ্রাম, গোচারণভূমি ইত্যাদির পরিকল্পিত ব্যবস্থা ছিল না। সকলেই তাদের নিজেদের খেয়াল-খুশিমতো এবং সুবিধামতো তাদের বাসস্থান তৈরি করত, এবং তার ফলে সব কিছুই অবিন্যস্ত ছিল। কিন্তু পৃথু মহারাজের সময় থেকে পরিকল্পনা অনুসারে, নগর ও গ্রাম পত্তনের ব্যবস্থা শুরু হয়।

তাৎপর্য

এই বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, শহর এবং নগরের পরিকল্পনা নতুন নয়, তা চলে আসছে পৃথু মহারাজের সময় থেকে। ভারতবর্ষে অত্যন্ত প্রাচীন নগরেও সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা প্রত্যক্ষ হয়। *শ্রীমদ্ভাগবতে* এই প্রকার প্রাচীন নগরীর বহু বর্ণনা রয়েছে। এমন কি পাঁচ হাজার বছর আগেও, শ্রীকৃষ্ণের রাজধানী দ্বারকা ছিল অত্যন্ত সুপরিকল্পিত। মথুরা, হস্তিনাপুর (বর্তমান নতুন দিল্লী) ইত্যাদি নগরীও ছিল অত্যন্ত সুন্দর পরিকল্পনা অনুসারে। অতএব পরিকল্পনা অনুসারে নগর এবং শহর নির্মাণ আধুনিক যুগেই উদ্ভাবিত হয়নি, প্রাচীন যুগেও তা বিদ্যমান ছিল।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের 'পৃথু মহারাজ কর্তৃক পৃথিবী দোহন' নামক অষ্টাদশ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।